

নিষিদ্ধ আলোর রেখা

একটি রোম্যান্টিক সাসপেন্স উপন্যাসিকা



অনাবিল সেনগুপ্ত

নিষিদ্ধ আলোর রেখা

একটি রোম্যান্টিক সাসপেন্স উপন্যাসিকা

অনাবিল সেনগুপ্ত

anabilsengupta.com

নিষিদ্ধ আলোর রেখা

নিষিদ্ধ আলোর রেখা

রোম্যান্টিক সাসপেন্স উপন্যাসিকা

লেখক: অনাবিল সেনগুপ্ত

প্রথম সচিত্র সংস্করণ, ২০২৬

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ ও অন্তর্চিত্র: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সহায়তায় নির্মিত, লেখকের নির্দেশনায়

ওয়েবসাইট: <https://anabilsengupta.com/>

নিষিদ্ধ আলোর রেখা

উৎসর্গ

যে মানুষগুলো কাছে না থেকেও
পরস্পরের আলোর দিকে নজর রাখে।

১. বৃষ্টিভেজা ফেরত



বৃষ্টিভেজা বিকেলে প্রথম সূত্র

গঙ্গার ঘাট ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পুরোনো বাগানবাড়িটির নাম শ্রীধর ভিলা। দুপুরে তার বারান্দাজুড়ে রোদ নরম হয়ে গড়িয়ে পড়ে, আর বৃষ্টির পরে কাঁচের জানলায় লেগে থাকে কুয়াশার মতো অস্পষ্ট দাগ। বাড়িটিতে পিসেমশাই শশাঙ্কবাবুর সংসারে মানুষ হয়েছে অদिति। বাইশ বছর বয়স হলেও নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তার খুব সামান্য। শ্রীধর ভিলায় নিয়মের শব্দ শোনা যায়, হাসির শব্দ নয়।

রামতরণ গ্রন্থাগার বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিটের পথ। পাকা দালান, বিবর্ণ নামফলক, উঁচু কাঠের তাক আর পুরোনো কাগজের গন্ধে ভরা তার ঘরগুলো। সেখানেই সহকারী গ্রন্থাধ্যক্ষ অনিরুদ্ধ বাগচীর সঙ্গে অদিতির প্রথম কথা।

সেদিন বৃষ্টি থেমেছিল একটু আগে। অদিতি ধার নেওয়া ‘চিত্রলেখা’ বইটি কাউন্টারে রাখতেই অনিরুদ্ধ ফেরতের তারিখ দেখে বলেছিল, “এক দিন দেরি হয়েছে। আজ জরিমানা নেব না। বৃষ্টি আপনার হয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে।”

অদিতি হেসেছিল। বইটির ভেতর থেকে তখন একটি সরু কাগজ মেঝেতে পড়ে যায়। কাগজে মাত্র একটি বাক্য লেখা ছিল, “আলো যেখানে নিষিদ্ধ, সত্য সেখানেই লুকিয়ে থাকে।” নিচে কোনও নাম নেই, শুধু নীল কালিতে আঁকা ছোট একটি কেয়াফুল।

অনিরুদ্ধ কাগজটি হাতে নিয়ে অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেল।

“এটা বইয়ের মধ্যে ছিল?”

“হ্যাঁ। কেন?”

উত্তর না দিয়ে সে বইটির মলাট, সেলাই ও পুরোনো ইস্যু স্লিপ পরীক্ষা করল। তারপর খুব নিচু গলায় বলল, “বইটি আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে শেষ বার আপনার বাবার নামে ইস্যু হয়েছিল।”

অদিতির বুকের ভেতর কেঁপে উঠল। তার বাবা অরুণাভ সেনের মৃত্যু সম্পর্কে সে শুধু জানে, গঙ্গায় নৌকাডুবি হয়েছিল। মৃতদেহ পাওয়া যায়নি।

বাড়ি ফেরার সময় অদিতির মনে হলো, কেউ তাকে অনুসরণ করছে। বাঁকের কাছে ফিরে তাকিয়ে সে শুধু একটি কালো ছাতা দেখল। মানুষটির মুখ দেখা গেল না।

সেই রাতে শ্রীধর ভিলার উত্তর দিকের বহুদিন বন্ধ ঘর থেকে ঘড়ির শব্দ ভেসে এল। অথচ ঘরটিতে কোনও ঘড়ি থাকার কথা নয়।

নিষিদ্ধ আলোর রেখা

২. নিষিদ্ধ তালিকা

পরদিন অদিতি আবার গ্রন্থাগারে গেল। অনিরুদ্ধ তাকে কর্মীদের ছোট ঘরে নিয়ে জানাল, রামতরণ গ্রন্থাগারের পুরোনো ইস্যু খাতার একটি অংশ কয়েক মাস আগে হারিয়ে গেছে। যে বছর অরুণাভ সেন নিখোঁজ হন, ঠিক সেই বছরের খাতা।

“আপনি আমাকে আগে বললেন না কেন?” অদিতি প্রশ্ন করল।

অনিরুদ্ধ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, “কারণ আপনার বাবার নাম শুধু পাঠকের তালিকায় ছিল না। তিনি গ্রন্থাগারের জমি রক্ষার কমিটির সদস্যও ছিলেন। নিখোঁজ হওয়ার আগে তিনি কয়েকটি দলিল এখানে জমা দিয়েছিলেন।”

গ্রন্থাগারের পেছনের সিঁড়ি দিয়ে তারা পুরোনো নথিঘরের সামনে গেল। দরজায় নতুন তালা। অথচ তালাটি কারও লাগানোর কথা নয়। অনিরুদ্ধ চাবি আনতে নিচে নামলে অদিতি দরজার নিচে আটকে থাকা একটি ছেঁড়া খাম দেখতে পেল। খামের ওপর বাবার হাতের লেখা সে চিনতে পারল না, কিন্তু প্রাপকের নাম স্পষ্ট ছিল: শশাঙ্ক সেন। তার পিসেমশাই।

খামের ভেতরে চিঠি নেই। ছিল একটি পুরোনো আলোকচিত্র। ছবিতে অরুণাভ, শশাঙ্ক এবং আরেক তরুণ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। তৃতীয় মানুষটির মুখ ধারালো কিছু দিয়ে ঘষে নষ্ট করা। ছবির পেছনে লেখা, “দলিল তিনটি আলাদা জায়গায় রাখলাম। কাউকে সম্পূর্ণ সত্য জানানো যাবে না।”

অনিরুদ্ধ ফিরে এসে ছবিটি দেখে বলল, “তৃতীয় মানুষটি সম্ভবত রূপচাঁদ সেনের বাবা।”

নিষিদ্ধ আলোর রেখা

রূপচাঁদের নাম অদिति আগেও শুনেছে। শহরের প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, শশাঙ্কবাবুর খুব ঘনিষ্ঠ। সেই সন্ধ্যাতেই বাড়িতে এসে শশাঙ্কবাবু জানানেন, রূপচাঁদের সঙ্গে অদিতির বিয়ের কথা প্রায় পাকা।

অদिति প্রতিবাদ করতেই তিনি বললেন, “তোমার বাবার মতো অবিবেচক হতে যেয়ো না। কিছু আলো মানুষকে পথ দেখায় না, পুড়িয়ে দেয়।”

রাতে অদিতির দরজার নিচে একটি গ্রন্থাগারের রসিদ ঢুকে এল। অনিরুদ্ধের হাতের লেখায় শুধু সময় ও স্থান: “শনিবার, সন্ধ্যা ছটা, বাঁ দিকের গেট।”

কাগজটির নিচে আরেকটি বাক্য অন্য হাতে লেখা: “তুমি গেলে সে আর ফিরবে না।”

৩. কেয়াফুলের সংকেত



নথিঘরের গোপন কুঠুরি

হুমকি সত্ত্বেও অদিতি শনিবার বেরোল। শ্রীধর ভিলার বাঁ দিকের গেট সত্যিই খোলা ছিল। বাইরে অনিরুদ্ধ অপেক্ষা করছিল না। পথের ওপর পড়ে ছিল তার ভাঙা চশমার একটি কাচ।

দূরে কেয়াবনের ভেতর থেকে ক্ষীণ আলো জ্বলল, নিভল, আবার জ্বলল। অদিতি বাবার পুরোনো ডায়েরিতে পড়েছিল, টানা দুই বার আলো নিরাপদ পথের সংকেত। সে ঝোপ সরিয়ে এগিয়ে গিয়ে নদীর ধারের পরিত্যক্ত ছাউনিতে অনিরুদ্ধকে পেল। তার কপালে কেটে গেছে, কিন্তু হাতে শক্ত করে ধরা ছিল নথিঘরের চাবি।

“কেউ পেছন থেকে আঘাত করেছিল,” সে বলল। “চাবি নিতে পারেনি।”

অদিতি তার কপালের রক্ত ভেজা রুমাল দিয়ে মুছে দিল। খুব কাছে থেকেও তারা কেউ অপ্রয়োজনীয় কোনও কথা বলল না। অনিরুদ্ধ শুধু অদিতির হাতের ওপর এক মুহূর্ত হাত রেখে বলল, “আপনাকে এই বিপদে জড়ানো উচিত হয়নি।”

অদিতি ধীরে হাত সরিয়ে নিল, কিন্তু তার কণ্ঠ স্থির ছিল। “এটা আমার বাবার সত্য। বিপদে আমি আগে থেকেই জড়ানো।”

সেই রাতেই তারা গ্রন্থাগারের নথিঘরে ঢুকল। একটি আলমারির পেছনে পাওয়া গেল সরু গোপন কুঠুরি। সেখানে নীল ফিতেয় বাঁধা কয়েকটি চিঠি, জমির খতিয়ানের নকল এবং একটি অডিও ক্যাসেট ছিল। অরুণাভের শেষ চিঠিতে লেখা, গ্রন্থাগার ও লাগোয়া জমি আত্মসাৎ করার জন্য জাল দলিল তৈরি হয়েছে। তিনজন অংশীদারের একজন বাধা দিলে তাকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনাও ছিল।

শেষ পাতাটি অনুপস্থিত। ফলে অপরাধীর নাম জানা গেল না।

ঠিক তখন দরজার বাইরে পায়ের শব্দ হলো। ভেজা মেঝেতে কাদার ছাপ ক্রমশ কাছে এগিয়ে এল। অনিরুদ্ধ আলো নিভিয়ে অদিতিকে নিজের আড়ালে টেনে নিল। অন্ধকারে অদিতি তার দ্রুত শ্বাস শুনতে পেল। দরজার কাছে একটি মানুষের ছায়া স্থির হয়ে রইল।

তারপর বাইরে থেকে শশাঙ্কবাবুর কণ্ঠ শোনা গেল, “অদিতি, দরজা খোলো। অনিরুদ্ধকে বিশ্বাস কোরো না।”

৪. বিশ্বাসের ফাঁক



বৃষ্টির আড়ালে নজরদারি

দরজা খুলতেই শশাঙ্কবাবু অনিরুদ্ধের দিকে তাকিয়ে বললেন, “ওর বাবা জাল দলিল তৈরির মামলায় অভিযুক্ত ছিল। অরুণাভ নিখোঁজ হওয়ার পর সে শহর ছেড়ে পালায়।”

অনিরুদ্ধ কথাটি অস্বীকার করল না। সে স্বীকার করল, তার বাবা নিবারণ বাগচী রূপচাঁদের বাবার হিসাবরক্ষক ছিলেন। মামলার কলঙ্ক থেকে বাঁচতে অনিরুদ্ধ নিজের পরিচয়ের এই অংশ অদিতিকে বলেনি।

অদিতির মনে হলো, নথিঘরের অন্ধকার আরও ঘন হয়ে উঠেছে। এত দিন অনিরুদ্ধের নীরবতাকে সে সততা ভেবেছিল। এখন সেই নীরবতার মধ্যেই গোপন দরজা দেখতে পাচ্ছে।

শশাঙ্কবাবু চিঠিগুলো নিতে চাইলে অদिति বাধা দিল। “এগুলো পুলিশকে দেব।”

“অসম্পূর্ণ কাগজ প্রমাণ নয়,” তিনি বললেন। “বরং তোমার বাবার সম্মান নষ্ট হবে।”

পরদিন রূপচাঁদ অদিতির সঙ্গে দেখা করতে এল। তার ব্যবহার বিনয়ী, কথাবার্তা পরিমিত। সে জানাল, শশাঙ্কবাবু অসুস্থ; দ্রুত বিয়ে হলে অদিতির ভবিষ্যৎ নিরাপদ হবে। কথার ফাঁকে সে নীল ফিতেয় বাঁধা চিঠির কথা উল্লেখ করল। অথচ চিঠিগুলোর কথা অদिति, অনিরুদ্ধ ও শশাঙ্কবাবু ছাড়া আর কারও জানার কথা নয়।

অদिति তখনই বুঝল, রূপচাঁদ তাদের ওপর নজর রাখছে। তবু সে বিয়েতে সম্মতির ভান করল। কারণ রূপচাঁদের বাড়িতে ঢোকা ছাড়া শেষ দলিলটি পাওয়ার আর কোনও পথ নেই।

অনিরুদ্ধ পরিকল্পনার বিরোধিতা করল। “আপনি নিজেকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করছেন।”

“আপনি সত্য গোপন করেছিলেন,” অদिति বলল। “এ বার সিদ্ধান্ত আমার।”

অনিরুদ্ধ মাথা নিচু করল। “আপনার রাগ ন্যায্য। তবু বিপদে ডাকলে আসব।”

নিষিদ্ধ আলোর রেখা

অদিতি চলে যাওয়ার পর সে গ্রন্থাগারের পুরোনো ক্যাসেট প্লেয়ারটি মেরামত করতে বসে। গভীর রাতে ক্যাসেটের ভাঙা শব্দের মধ্যে একটি কণ্ঠ স্পষ্ট হলো: “শশাঙ্ক নির্দোষ। আসল হিসাব লুকোনো আছে রূপচাঁদের বাড়ির নীল ঘরে।”

ঠিক সেই মুহূর্তে গ্রন্থাগারের সমস্ত আলো নিভে গেল।

৫. নীল ঘরের আয়না



আয়নার পেছনে লুকোনো দলিল

বিয়ের আশীর্বাদের দিন অদিতি প্রথম রূপচাঁদের বাড়িতে গেল। নিচতলায় অতিথিদের ভিড়, ওপরে নীল রঙের বন্ধ ঘর। কাজের মেয়ের কাছ থেকে সে জানতে পারল, ঘরটি রূপচাঁদের বাবার মৃত্যুর পর থেকে তালাবন্ধ।

অনুষ্ঠানের মাঝখানে বিদ্যুৎ চলে গেলে অদিতি চুপচাপ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। অনিরুদ্ধের দেওয়া সরু ইস্পাতের পাত দিয়ে তালা খুলতে বেশি সময় লাগল না। ঘরের ভেতর বড় একটি আয়না, পুরোনো সিন্দুক এবং দেওয়ালে অরুণাভের সেই একই আলোকচিত্র। এখানে তৃতীয় মুখটি অক্ষত। মানুষটি রূপচাঁদের বাবা নয়, শ্রীধর ভিলার প্রাক্তন তত্ত্বাবধায়ক হরিপদ।

আয়নার কাঠের ফ্রেমে কেয়াফুল খোদাই করা ছিল। চাপ দিতেই ফ্রেমের পেছনে ছোট খোপ খুলে গেল। সেখানে শেষ দলিল, নিবারণ বাগচীর স্বীকারোক্তি এবং একটি সংবাদপত্রের কাটিং পাওয়া গেল। নিবারণ জাল দলিল বানিয়েছিলেন, কিন্তু পরে অনুতপ্ত হয়ে অরুণাভকে প্রমাণ দেন। হরিপদ রূপচাঁদের বাবার নির্দেশে অরুণাভকে নৌকায় ডেকে নিয়েছিল। দুঘটনা সাজানো হলেও অরুণাভকে হত্যা করা হয়েছিল কি না, স্বীকারোক্তিতে তা স্পষ্ট নয়।

হঠাৎ দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হলো। আয়নায় অদিতি রূপচাঁদকে দেখতে পেল।

“তুমি বুদ্ধিমতী,” সে বলল। “এই জন্যই তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। শ্রীধর ভিলা আর গ্রন্থাগারের জমি একই উত্তরাধিকার সূত্রে তোমার নামে আসবে।”

অদিতি দলিলটি আঁচলের ভাঁজে গুঁজে বলল, “তুমি আমাকে নয়, আমার স্বাক্ষরকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন।”

রূপচাঁদ এগিয়ে আসতেই নিচে গাড়ির হর্ন শোনা গেল। সেটিই ছিল অদিতির ঠিক করা সংকেত। অনিরুদ্ধ, শশাঙ্কবাবু এবং আইনজীবী মধুমিতা সেন বাড়ির ফটকে অপেক্ষা করছিলেন। অদিতি জানালার কাচ ভেঙে দলিলটি নিচে ফেলে দিল।

রূপচাঁদ তার কবজি চেপে ধরল। “একটি কাগজে কিছু প্রমাণ হয় না।”

অদিতি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, “ঠিক। তাই তোমার কথাও রেকর্ড হচ্ছে।”

তার চুলের ক্লিপে বসানো ছোট রেকর্ডারের লাল আলো তখন নিঃশব্দে জ্বলছিল।

৬. যে আলো দখল করা যায় না



আলোরেখা পাঠ ও সহায়তা কেন্দ্র

পরের কয়েক সপ্তাহে তদন্ত এগোল ধীরে, কিন্তু দৃঢ়ভাবে। নিবারণের স্বীকারোক্তি, অরুণাভের চিঠি, জমির আসল খতিয়ান, রূপচাঁদের রেকর্ড করা বক্তব্য এবং হরিপদের পুরোনো ব্যাংক হিসাব একে অন্যের সঙ্গে মিলে গেল। নদীর ধারে পরিত্যক্ত নৌকাঘর খুঁড়ে অরুণাভের ঘড়ি ও ব্যক্তিগত সিলমোহর উদ্ধার হলো। মৃত্যুর সম্পূর্ণ বিবরণ আর জানা গেল না, কিন্তু জমি আত্মসাৎ, প্রমাণ নষ্ট, ভয় দেখানো ও অদিতিকে আটকে রাখার অভিযোগে রূপচাঁদ গ্রেপ্তার হলো।

শশাঙ্কবাবু অদিতির কাছে স্বীকার করলেন, অরুণাভের চিঠি তিনি পেয়েছিলেন।
ভাইকে বাঁচাতে পৌঁছাতে পারেননি। পরে অদিতিকে নিরাপদ রাখার ভয়ে সব চাপা
দিয়েছিলেন। তাঁর ভয়ই শেষ পর্যন্ত রূপচাঁদের সবচেয়ে বড় ঢাল হয়ে উঠেছিল।

অদिति বলল, “নীরবতা সব সময় নির্দোষ থাকে না।”

শশাঙ্কবাবু মাথা নত করলেন। “জানি। তাই এ বার যা জানি, সব বলব।”

অনিরুদ্ধও নিজের বাবার পরিচয় গোপন করার জন্য ক্ষমা চাইল। অদिति তাকে
সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করল না। বিশ্বাস ফিরে আসতে সময় লাগে। তবে সে বুঝেছিল,
অনিরুদ্ধ সত্য পাওয়ার জন্য নিজের পরিবারের কলঙ্কও প্রকাশ করেছে।

রায়ের দিন সন্ধ্যায় তারা গঙ্গার সিঁড়িতে পাশাপাশি বসেছিল। দীর্ঘ নীরবতার পরে
অনিরুদ্ধ বলল, “আমাদের সম্পর্কের নাম কী হবে, জানি না। কিন্তু কোনও সত্য আর
আপনার কাছ থেকে লুকোব না।”

অদिति নদীর দিকে তাকিয়ে বলল, “নাম এখনই দরকার নেই। আলো আছে কি না,
সেটাই আগে দেখি।”

কয়েক মাস পরে শ্রীধর ভিলার সামনের জমি ও রামতরণ গ্রন্থাগারের সংরক্ষিত
অংশ নিয়ে ‘আলোরেক্ষা’ পাঠ ও সহায়তা কেন্দ্র তৈরি হলো। সেখানে মেয়েরা বই পড়ে,
আইন সম্পর্কে শেখে, কম্পিউটার ব্যবহার করে এবং নিজের অর্থব্যবস্থার প্রাথমিক
পাঠ নেয়। অনিরুদ্ধ সপ্তাহে দুদিন বই নির্বাচন ও পাঠচক্র চালায়। অদिति নিজের নামে
লেখে।

নিষিদ্ধ আলোর রেখা

এক বর্ষার সন্ধ্যায় অনিরুদ্ধ তাকে একটি মেরামত করা ‘চিত্রলেখা’ বই দিল। প্রথম পাতায় কোনও প্রেমপত্র ছিল না। শুধু স্বচ্ছ খামে রাখা সেই পুরোনো কেয়াফুল আঁকা কাগজটি। তার নিচে অনিরুদ্ধ লিখেছে, “আলো নিষিদ্ধ ছিল না। নিষিদ্ধ ছিল সত্যের কাছে পৌঁছানো।”

অদिति কলম তুলে তার নিচে যোগ করল, “তাই আমরা আলোকে কারও দখলে দিইনি।”

দরজার বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। কাছেই অনিরুদ্ধ দাঁড়িয়ে। তাদের হাত একবার ছুঁয়ে গেল, তারপর পাশাপাশি স্থির হলো। প্রতিশ্রুতির ভার নেই, মালিকানার দাবি নেই, তবু দূরত্বও আর আগের মতো নয়।

শহর ধীরে ধীরে ঘটনাটি ভুলে গেল। কিন্তু রামতরণ গ্রন্থাগারের উত্তর দেওয়ালে প্রতি বর্ষায় একটি সরু সোনালি আলোর রেখা এসে পড়ে। অদिति যখনই সেটি দেখে, তার মনে হয়, কিছু ভালোবাসা রহস্যের সমাধানে শেষ হয় না। সত্যের পাশে দাঁড়াতে দাঁড়াতেই তারা নিজের ভাষা খুঁজে নেয়।

সমাপ্ত

লেখক পরিচিতি

অনাবিল সেনগুপ্ত পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। তিনি সাহিত্য, বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবাদ, মানবিকতা ও সামাজিক প্রশ্ন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে লিখছেন। তাঁর রচনায় ব্যক্তিস্বাধীনতা, সম্পর্কের মর্যাদা এবং সমাজের প্রচলিত বিশ্বাসকে প্রশ্ন করার প্রবণতা বিশেষভাবে উপস্থিত।

ওয়েবসাইট: <https://anabilsengupta.com/>